পরিক্রমা

পাওয়ার সাধন, দেওয়ার সাধন

এযুগে অবতারের জীবনের কথা ইতিহাসের মর্যাদা পেয়েছে। দুটি অপূর্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী। একটি হল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'—তখনকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—'শ্রীম' নামে শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতকথা স্মৃতিতে ধারণ করে পরিবেশন করেছেন। সে-বাণী বেদ-বেদান্ত-দর্শন-পুরাণ ও ভক্তিশাস্ত্রের ওপর নতুন আলোকসম্পাত। হারানো পুরোনো শাশ্বত চিরন্তন অধ্যাত্মজ্ঞান সহজ ভাষায়, সরল স্বচ্ছন্দ উপমায় তুলে ধরেছেন এযুগের বেদমূর্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সরস মন্তব্য, বাক্য, কথোপকথন, নিত্যনতুন গল্প—তত্ত্বকে স্বচ্ছ করে সরাসরি মর্ম স্পর্শ করে। লেখক নিজেকে নেপথ্যে রেখে সামনে এনেছেন যুগের দেবতাকে।

অপর গ্রন্থটি হল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। সেখানে অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে স্বামী সারদানন্দ এই নবযুগের পুরুষোত্তমের মহান জীবনের বিচিত্র বর্ণনা দিয়েছেন। সেই জীবনের সঙ্গে জড়িত আছে আর এক ইতিহাস। কৈবর্তজাতীয় রানি রাসমণি ও তাঁর জামাই মথুরানাথ বিশ্বাস কোন দৈবপ্রেরণায় গঙ্গার কূলে রূপ দিলেন এক স্বপ্নের। জগন্মাতার নির্দেশেই দ্বাদশ শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির সহ কালীমন্দিরে মায়ের প্রতিষ্ঠা হল ধুমধাম করে স্নানযাত্রার শুভদিনে। সুদূর কামারপুকুর থেকে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন স্নেহের অনুজ, শাস্ত্রপাঠে বিমুখ উনিশ-কুড়ি বছরের তরুণ গদাধর। মঞ্চ প্রস্তুত। কালীবাড়িতে সুবিস্তৃত উদ্যান, ঝোপ-জঙ্গল, সামনে প্রবাহিত মা সুরধুনী—নির্জন, নিরালা স্থান। সাধনার অনুকূল কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি শক্তিক্ষেত্র।

১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে দেবীর পূজা রামকুমারের কাছে শিখে মথুরবাবুর একান্ত অনুরোধে দেবীর সেবা ও পূজায় নিযুক্ত হলেন। রাগানুগা ভক্তির পথে প্রথম তিনি মায়ের দর্শন লাভ করলেন। কালীমন্দিরে দেবী ভবতারিণীর শ্রীমূর্তিতে এক দিব্য আবির্ভাবে পরিবেশ থমথম করত। দিব্যোন্মত্ততায় ঠাকুরের আচরণও বৈধীভক্তির সীমা ভেঙে ধাবিত হয়েছিল আপন পথে। পূজা করতে করতে মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন ভাবের ঘোরে। রাতে ঘুম নেই, কখনও বা পঞ্চবটীতে ধ্যানমগ্ন। এইসময় কর্মচারীদের নালিশ শুনে মথুরবাবু এলেন এবং অনুভব করলেন দেবী ওই অদ্ভুত সাধকের সেবা-পূজায় সত্যিই জাগ্রতা হয়েছেন—তাঁদের মন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক। মাত্র ছয়মাস। তারপরই শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর-উন্মাদনা দেখে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন মথুর। হলধারী বা রামতারক জগদম্বার পূজার কাজে ব্রতী হলেন। সেবাপরাধে তাঁর সন্তানের মৃত্যুর পর হৃদয় দেবীপূজার দায়িত্ব নিলেন।

১৮৫৫ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত বারো বছর ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকাল। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৩ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে তন্ত্রের সাধন। পরবর্তী তিন বছর রামমন্ত্রে উপাসনা, বৈষ্ণবভাবে সাধনা। অদ্বৈতসাধনা। এই সাধনার বিস্তারিত বর্ণনা শ্রীরামকৃষ্ণেরই মুখে শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন লীলাপ্রসঙ্গকার। কথামৃতে তাঁরই মুখের কথায় পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা :

''তিনি (জগন্মাতা) আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন। প্রথম, পুরাণ মতের—তারপর তন্ত্র মতের, আবার বেদ মতের। প্রথমে পঞ্চবটীতে

সাধনা করতাম। তুলসীকানন হল—তার মধ্যে বসে ধ্যান করতাম। কখনও ব্যাকুল হয়ে 'মা! মা!' বলে ডাকতাম—বা 'রাম! রাম!' করতাম।... সে সময়ে পূজা করতে করতে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হত—পূজারই আনন্দ!

''তন্ত্র মতের সাধনা বেলতলায়। তখন তুলসী গাছ—সজনের খাড়া—এক মনে হত!

''সে অবস্থায় শিবানীর উচ্ছিষ্ট—সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে—তা সাপে খেলে কি কিসে খেলে তার ঠিক নাই—ওই উচ্ছিষ্টই আহার।

''কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াতাম, আর নিজেও খেতাম। সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।—মাটিতে জল জমবে তাই আচমন, আমি সে মাটিতে পুকুর থেকে জল দিয়ে আচমন কল্লাম।

''অবিদ্যাকে নাশ না করলে হবে না। আমি তাই বাঘ হতাম—হয়ে অবিদ্যাকে খেয়ে ফেলতাম!

''বেদমতে সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলাম। তখন চাঁদনিতে পড়ে থাকতাম—হৃদুকে বলতাম, 'আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, চাঁদনিতে ভাত খাব'!

''হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম! মাকে বললাম, আমি মুখ্যু—তুমি আমায় জানিয়ে দাও—বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে—নানাশাস্ত্রে—কি আছে।

''মা বললেন, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে, তাঁকে তন্ত্রে বলে সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—আবার তাঁকেই পুরাণে বলে, সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ।

''গীতা দশবার বললে যা হয়, তাই গীতার সার। অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী।

''তাঁকে যখন লাভ হয়, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র—কত নিচে পড়ে থাকে। তখন ওঁ উচ্চারণ করবার জো নাই।... সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ওঁ উচ্চারণ করতে পারি না।''

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছেন, ''প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সেসব হয়েছিল। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ।'' এই হল শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সাধনের চালচিত্র। কিন্তু এবারের অনুভূতি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে—সেকথা আমরা ঠাকুরের মুখেই শুনেছি। প্রাচীন যুগের সাধকেরা তাঁকে দেখে তাঁদের রীতি অনুযায়ী মেলাতে চেয়েছেন অবতারপুরুষের লক্ষণগুলি। তাঁরা অর্থাৎ যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী, ইঁদেশের সাধক পণ্ডিত গৌরীকান্ত, বৈষ্ণবসমাজের প্রতিভূ বৈষ্ণবচরণ—এঁরা মথুরবাবু থাকতেই ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণা করেছেন। ভৈরবী বলেছেন—এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। পদ্মলোচন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে বলেছেন—আপনার ভিতরে আমি ঈশ্বরীয় আবির্ভাব ও শক্তি দেখছি। বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত ভাষায় স্তব রচনা করে ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের সামনে তাঁর অবতারত্ব কীর্তন করেছিলেন। বলেছিলেন, যে প্রধান প্রধান উনিশ রকম ঈশ্বরীয় ভাবের সম্মিলনকে ভক্তিশাস্ত্র মহাভাব বলে নির্দেশ করেছেন, এবং যা কেবল শুধু ভাবময়ী শ্রীরাধিকা ও ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই এ-পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, তার সব লক্ষণগুলিই শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে প্রকাশিত।

আবার গৌরীপণ্ডিত ঠাকুরকে বলেছিলেন—শাস্ত্রে যেসব উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা পড়েছি, সেসবই তোমাতে সাক্ষাৎ বর্তমান দেখছি। শাস্ত্রে যা লিপিবদ্ধ নেই, এমন সব উচ্চাবস্থার প্রকাশও তোমাতে রয়েছে। তোমার অবস্থা বেদবেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অতিক্রম করে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে, তুমি মানুষ নও, অবতারপুরুষদের উৎপত্তি যেখান থেকে, সেই বস্তু তোমার ভিতরে রয়েছে।

এছাড়াও ছিলেন ষড়্দর্শনে পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী। তাঁর মনে হয়েছিল শাস্ত্রে যা পড়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যতনুতে সেসব অনুভূতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর অনুভবে সকল শাস্ত্র মিলেছে

একত্রে। এমন কত সাধক, সিদ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ধন্য হয়েছেন নিরক্ষর মানুষটির কাছে এসে। তাঁরা নিজেদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে পূর্ণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে।

ঠাকুরের এক-একটি সাধনার অন্তে সারা ভারতবর্ষ থেকে কোন দৈব আকর্ষণে ছুটে এসেছেন সেই সেই ভাবের সাধককুল। কখনও শুধু পরমহংসের মেলা ওই দক্ষিণেশ্বরের ছোট ঘরটিতে। কখনও এসেছেন বৈষ্ণব বাবাজীরা। কী তাঁদের নিষ্ঠাভক্তি! কখনও শৈব যোগীর দল, কখনও বা তন্ত্রসাধকেরা। বহু সাধনার ধারা এসে মিলিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাসাগরে। এও বাহ্য। কামারপুকুরের শিশু গদাইকে প্রাণের আবেগে ইষ্টজ্ঞানে পূজা করেছেন, খাইয়েছেন কামারপুকুরের বহু নরনারী। গদাইয়ের প্রাণমাতানো সঙ্গে কী নির্মল আনন্দই না তাঁরা অনুভব করতেন! রঙ্গ-রসিকতায়, নৃত্যগীতে, অভিনয়ে সকলকে ভুলিয়ে মাতিয়ে আনন্দের হাট বসিয়েছিলেন ওই দেবকিশোর। কিন্তু তার মধ্যেই তন্ন তন্ন করে দেখে নিয়েছেন নরনারীর চরিত্রগুলি, তাদের সহজপ্রবণতা, কোথাও বা ভণ্ডামি। জগতকে ছেঁকে সত্যকে আলাদা করে নিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনতা তখন থেকেই এসে গেছে। তাই বৈরাগ্যের পাঠ নিচ্ছেন ভূতির খালের শ্মশানে, লাহাবাবুদের অতিথিশালায় পান্থপথিক সাধুদের কাছে। একটা তীক্ষ্ণ বিচারের আলো তাঁর মায়ামোহের জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল তখন থেকেই। তাই কামারপুকুর থেকে অনায়াসেই চলে গেলেন কলকাতা মহানগরীতে, যেখানে সাধনার বেদি প্রস্তুত হচ্ছে।

দাপুটে রাশভারি জমিদার মথুর ওই উনিশ-কুড়ি বছরের গ্রাম্য, সরল, রূপবান, ভাবুক যুবককে দেখে মুগ্ধ হলেন। মানুষী তনু আশ্রয় করা ঐশ্বর্যবিহীন বিদ্যাবিহীন এক যুবককে সমাজের মানুষ কী চোখে দেখতে পারে! কিন্তু কী করে যে রানি রাসমণি ও মথুরবাবু তাঁদের কর্মচারীর এই উদাসীন ভাইটিকে চিহ্নিত করে একান্ত আপনবোধে সেবা করেছিলেন দীর্ঘ বারো বছর, সে-রহস্য আপাতদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য। কিন্তু তাঁদের সহায়তা না পেলে ওই বারো বছরের বিচিত্র সাধনার প্রবল স্রোত বয়ে যাওয়ার জায়গা পেত না।

ওই সাধকভাবের সময় থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণকে লক্ষ করতেন ম্যাগাজিনের শিখ রক্ষীরা। কোয়ার সিং ছিলেন তাঁদের হাবিলদার। তাঁদেরই মাধ্যমে প্রথম বড়বাজারের মারোয়াড়ি সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা ছড়িয়ে পড়ে। মারোয়াড়ি ভক্তেরা নানা কামনায় জিনিসপত্র নিয়ে সাধুদর্শন করতে আসতেন। তারপর এলেন কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র। কেশবচন্দ্র ছাড়া কেউ কলম ধরলেন না। লিখতে পারতেন বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু না। তাঁদের লেখনীতে আধ্যাত্মিক পুরুষের ছবি ওঠেনি।

মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে বছরের পর বছর নানা ভোগসুখে ও আরামের ভেতর রাখবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু না, তাঁর ঊর্ধ্বগামী মনকে সংসারের কোনও ভোগসুখেই নামাতে পারলেন না। দেখলেন, হিংসাদ্বেষকপটতাপূর্ণ কামক্রোধের চির আবাসভূমি এই পৃথিবীতে যেন করুণায় দু-দিনের জন্য নেমে এসেছেন অমর্ত্য দেবতা। কী না করেননি মথুর—ধন, সুন্দরী রমণী, নিজের ও পরিবারবর্গের সকলের ওপর প্রভুত্ব, ঠাকুরের আত্মীয়-পরিজনের জন্য ব্যয়—তবু সাধারণের মতো কোনও বাহ্যিক আড়ম্বরেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভোলেননি। তখন মথুর শরণ নিয়েছেন তাঁর অভয় আশ্রয়ে। দেখেছেন সেখানে সাতখুন মাপ। দেখেছেন ঠাকুর কোনও কিছুর প্রার্থী নন, বরং তাঁকে কিছু দিয়ে মথুর সপরিবারে কৃতার্থ বোধ করতেন। 'বাবা'কে খাওয়াতেন সোনা-রুপোর বাসনে। বাবা খেয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে চলে যেতেন। দায় ছিল

মথুরের—সেসব সাজিয়ে গুছিয়ে তালাচাবি দিয়ে আবার তুলে রাখতেন বহুযত্নে। লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ির সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে বিষয় লিখে দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন মথুর—জানতে পেরে মথুরকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিলেন ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ।

সাধনার শেষ। মথুর নেই। রসদদার চলে গেছেন লীলাপ্রাঙ্গণ ছেড়ে। কিন্তু ওই দক্ষিণেশ্বরের ঘরটিতে তিনি অপেক্ষা করছেন। পাওয়ার সাধনার শেষে দেওয়ার সাধনা। যেমন বহু বৎসর সমাধিস্থ হয়ে আচার্য শংকরের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন গোবিন্দপাদ নর্মদার তীরে গুহায়। দেওয়া শেষ হলে মহাযোগে দেহত্যাগ করলেন।

অবতারের ভাব ধারণক্ষম অন্তরঙ্গ পার্ষদদের জন্য অপেক্ষারত শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বললেন—এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্য কীভাবে প্রতীক্ষা করে আছি তা একবার ভাবতে নেই?... প্রাণের কথা কাউকে বলতে না পেরে আমার পেট ফুলে রয়েছে।

তাঁর পার্ষদরা তাঁকে পেয়েছেন কেউ দুই, কেউ চার, কেউ পাঁচ-ছয় বছর—অর্থাৎ তাঁর লীলার অন্ত্যভাগে। দেখেছেন সেই অপূর্ব মহামানবকে, জগদম্বার বালককে, যিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদরাশি আগলে প্রতীক্ষা করছেন নবীন যুগের মুক্তমনা অন্তরঙ্গদের জন্য। তাঁরা কেউ স্কুল-কলেজে পড়েছেন, কেউ পড়েননি। তাঁরাই ছিলেন যুগের জহুরি। তাঁদের কাছে নিজের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তিনি, কারণ তাঁরা সব নতুন হাঁড়ি—যাতে নিশ্চিন্তে দই রাখা যায়। তাঁরা সংসার-খোলা থেকে ছিটকে আসা শুভ্র খই।

যেমন যেমন পার্ষদরা আসছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এক লহমায় তাঁদের চিনে নিয়ে টেনে নিচ্ছেন কাছে। ভালবাসার টানে সেই কিশোরদের কাছে বাবা-মা-বন্ধুর ভালবাসা তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের বলছেন—এ আমার কেমন স্বভাব বল তো? যারা আমাকে এক পয়সার বাতাসা দিতে পারে না, যাদের একখানা ছেঁড়া মাদুরও বসতে দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তাদের কাছে এত যাই কেন? পরে নিজেই বুঝিয়ে বলছেন—এদের দেখি যে সহজেই হবে। আর সকলের হওয়া বড় কঠিন—যেন দইয়ের হাঁড়ির মতো, দুধ রাখা চলে না। তাদের তিনি বলতেন, তোমাদের যাতে শীঘ্র শীঘ্র ভগবান লাভ হয় এজন্য প্রার্থনা করি। কাউকে বলতেন—এখানকার প্রতি ভালবাসা রেখো, তাহলেই হবে।

যুবকদের দল এসেছিলেন বেশির ভাগই ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে। কেউ বা এসেছিলেন তাঁর কথা কেশবচন্দ্রের 'ইন্ডিয়ান মিরর' কাগজে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর সাধনা, তাঁর অপূর্ব জীবন—কিছুই তাঁরা তেমন করে জানতেন না। তবু আসতেন এক দুর্বার ভালবাসার টানে। তেজস্বী নরেন্দ্রনাথও সেই আকর্ষণে বিহ্বল হতেন, অন্যদের কা কথা। নরেন্দ্রের ভাবনা ও বিচারশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। ঈশ্বরের জন্য এমন অদ্ভুত উন্মত্তভাব তিনি দেখেননি, অমন স্বাভাবিক ত্যাগের ভাবও বিরল। তাই তাঁর মনে হত—উন্মাদ হলেও এ-ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী এবং সেজন্যই মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাওয়ার যথার্থ অধিকারী। আবার ঠাকুরের কাছে কী আনন্দেই যে দিন কাটত—তা তাঁরা অপরকে বোঝাতে পারতেন না। সে-পবিত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসার জাতই আলাদা। তিনি তখন বয়সে প্রৌঢ়—হলে কী হবে! খেলা, রঙ্গরসের মধ্যে দিয়েই ওই অল্পবয়সি অন্তরঙ্গদের নিরন্তর উচ্চ শিক্ষা দান করে, তাদের অজ্ঞাতসারেই আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে ঠাকুরের ছেলেদের সেই আধ্যাত্মিক রূপ দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছিলেন স্বামী বিরজানন্দ বরানগর মঠে। তাঁরা যেন 'barning flame'। জগতকে অগ্রাহ্য করে ভূত-পালানো তপস্যায় মত্ত

সেদিনের রামকৃষ্ণ-তনয়েরা। যেন বলছেন—

কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥

কাম-কাঞ্চনত্যাগের মহান আদর্শ ঠাকুরের—এই প্রবল ভোগবাদের যুগে। গার্হস্থ্যজীবনে স্ত্রীকে গ্রহণ করেও দেখালেন উচ্চ অধ্যাত্মজীবন। গৃহস্থ ও সাধু উভয়কেই তিনি বলছেন—আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি—অর্থাৎ অতটা তোমরা পারবে না। বলছেন—আমি ষোলো টাং করেছি, তোরা এক টাং কর। তাতেও হবে। নতুন করে আদর্শকে উজ্জ্বল করলেন : ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য—তুলনায় আর সব নগণ্য। এই মহাসত্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ এক লহমায় বুঝে নিয়ে সমস্ত শক্তি ওই ঈশ্বর-অনুভবের জন্য ব্যয় করেছেন। আর সাধারণ মানুষ জীবনে ধাক্কা খেতে খেতে একসময় বুঝতে পারে—যা আছে কিছুই চিরকালের নয়। চিরকালের পথেও রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দুবাহু তুলে ডাকছেন—ওরে তোরা আয়।

ঠাকুরের ছেলেদের মুখের কথা—সে কী টান! কী অহৈতুকী ভালবাসা! তুলনা হয় না। সে-টানেই তাঁরা বাবা-মা, ঘর-সংসার ছেড়ে ওই ভূতুড়ে বাড়িতে গিয়ে উঠলেন—ভগবান লাভের প্রতিজ্ঞা নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা যে কী গভীর ও কী আশ্চর্য ছিল তার মূল্যায়ন করেছেন এঁরাই—নিজেদের জীবন দিয়ে। তাঁর প্রসন্ন গুরুভাব দেখে তাঁরা মোহিত :

''দেখিতে আমার পাও নাকো দোষ
নাই অভিমান নাহি তব রোষ
সদা হাসিমুখ প্রসন্ন সুমুখ,
হে আমার কল্পতরু॥''

সিংহবাহিনীর পূজা হচ্ছে শুনে মাকে দর্শন করতে যদু মল্লিকের বাড়ি গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যদু মল্লিক শুয়ে আছেন। মুখে মুখে অভ্যর্থনা। ঠাকুর প্রসাদ চেয়ে, জল চেয়ে খেলেন। যাঁরা সঙ্গে ছিলেন তাঁরা মহাবিরক্ত। ঠাকুর কিন্তু গৃহকর্তার প্রতি প্রসন্নই, দোষ ধরছেন না। বলছেন—ওগো, ওরা বিষয়ী। সারাক্ষণ বিষয় নিয়ে পাগল। ওরা যে এত বিষয়চিন্তার মাঝেও দেবীর পূজা করছে, এই তো যথেষ্ট!

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশবাবুর বাড়ি গিয়েছেন, যিনি আচার-বিচারের ধার ধারেন না। ঠাকুরের জন্য এক থালা দোকানের খাবার আনিয়ে সকলের বসার কার্পেটের ওপরেই রাখলেন। এমনসময় ভক্ত বলরাম উপস্থিত—কত নিষ্ঠায় তিনি জগন্নাথ ও ঠাকুরের সেবা করেন। তাঁর চক্ষুস্থির। ঠাকুর মুচকি হেসে বলছেন—এখানে এইরকম, আবার তোমার ওখানে যখন যাব—শুদ্ধাচার। তিনি কৃপাময়, তিনি প্রেমময়।

তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা দেখেছিলেন শুধু তাঁদের প্রতিই নয়, প্রতিটি মানুষের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা। কোনও কৃপাপ্রার্থীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন না। ভক্তদের প্রতি অহেতুক কৃপায় কখনও কখনও দিনে কুড়ি ঘণ্টা ধরে ঈশ্বরীয় কথা বলতেন। বহু বছর এভাবে চলেছিল।

তাঁর বাহ্য রূপ তখন মলিন। শ্রীশ্রীমার মুখে যৌবনে সাধনার কালে তাঁর রূপের কথা জানা যায় : তাঁর গায়ের রং যেন হরিতালের মতো ছিল—সোনার ইষ্টকবচের সঙ্গে গায়ের রং মিশে যেত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম, দেখতুম গা থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। তাঁকে শ্রীশ্রীমা কখনও নিরানন্দ দেখেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার কাছে বাইরের রূপ চাননি, আধ্যাত্মিক রূপ চেয়েছিলেন। তবে তাঁর পতিতপাবন নামটি গোপন করতে পারেননি। ওই রামকৃষ্ণ নাম শুনলে বিহ্বল হতেন স্বামীজী মহারাজ, তাঁর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেত। সেই নামটি তিনি রেখে গেছেন যুগের জন্য। তাঁর ধ্যানস্থ যোগমূর্তি কালে মানুষের ঘরে ঘরে পূজিত হবে, তখন সবাই মানবে—এও তাঁর মুখের কথা।